শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সহায়িকা

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সহায়িকা

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

বাড়ি নং ৯৩, রোড নং ১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল: grambangla@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.grambanglabd.org

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সহায়িকা

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি
বাড়ি নং ৯৩, রোড নং ১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইলঃ grambangla@yahoo.com

প্রণয়নেঃ
খন্দকার রিয়াজ হোসেন

সহযোগিতায়ঃ
এ কে এম মাকসুদ
সায়মা সাইদ

প্রকাশকালঃ
জুলাই, ২০১৫

তথ্যসূত্রঃ

১) শিশু বিকাশ: শিশু অধিকারের আলোকে (কিশোর-কিশোরীদের জন্য): প্রশিক্ষণ সহায়িকা
ইইসিআর প্রকল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ, জুন ২০১২।

২) মৌলিক ও পেশাগত সমাজ সেবা প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণ সহায়িকা
সিএসপিবি প্রকল্প, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ, ডিসেম্বর ২০১৪।

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গ্রামবাংলা

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি শিশুর সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত দুই দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। *'সবার আগে চাই শিশুর সুরক্ষা'* এই প্রত্যয় নিয়ে শিশুর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে গ্রামবাংলার পথ চলা।

গ্রামবাংলা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছে যে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে শিশুর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। দেশে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের আইন ও নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও শিশুরা নির্যাতনের হাত থেকে মোটেই রেহাই পাচ্ছে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মীরাও অনেক ক্ষেত্রে অসহায়। এজন্য সমাজের সকল পর্যায়ের দায়িত্ববান মানুষকে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্র-যুব-উন্নয়ন কর্মী সকলের সমন্বয়ে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে নিতে হবে সমাজভিত্তিক বাস্তবমূখী পন্থা।

গ্রামবাংলা মনে করে, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিটি কর্মীকে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে তাদের নিজ নিজ পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তবে, তার জন্য চাই প্রতিটি কর্মীর যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি সামর্থ্য। এজন্য গ্রামবাংলা তার সকল কর্মীর সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। আর এই প্রশিক্ষণকে সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এই নির্দেশিকা। গ্রামবাংলার বিশ্বাস, উন্নয়ন কর্মীদের শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে পারলে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

শিশুদের শৈশবকাল আনন্দ আর নির্বিঘ্নে কাটুক।

এ কে এম মাকসুদ
নির্বাহী পরিচালক
গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সহায়িকা সম্পর্কে কিছু কথা

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি তার সকল কর্মী ও শিক্ষকদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় 'শিশু নির্যাতন' সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়া ও নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উপর জোর দেয়া হবে যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের ধারণা ও উপায়সমূহ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।

প্রশিক্ষণ সহায়িকায় 'শিশু নির্যাতন ও তার প্রতিরোধ' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। মূলত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি জ্ঞাননির্ভর হলেও কর্মীগণের নিজ নিজ চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে। সেই সাথে প্রকল্প সময়কালীন শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও বিশেষ সুরক্ষা ও চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বাছাই ও যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি 'তাৎক্ষণিক নির্দেশিকা' হিসাবে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

খন্দকার রিয়াজ হোসেন
পরিচালক, প্রোগ্রাম্‌স
ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক
বর্জ্যজীবী শিশুদের কল্যাণ ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

সূচি

ক্রম	পাঠক্রম	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
২	শিশু নির্যাতন কী?	১
৩	শিশুর নির্যাতনকারী কে হতে পারে?	১
৪	শিশু নির্যাতনের ধরন - শারীরিক নির্যাতন - মৌখিক নির্যাতন - যৌন নির্যাতন - মানসিক নির্যাতন - অবজ্ঞাসূচক নির্যাতন	২ ২ ৩ ৪ ৬ ৭
৫	শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের উপায় - মাতাপিতা/অভিভাবক/শিক্ষক/সেবা প্রদানকারীর দিক থেকে - শিশুদের দিক থেকে - হেল্পলাইন-১০৯৮	৯ ৯ ১০ ১০
৬	নির্যাতিত শিশু সনাক্তকরণ	১০
৭	নির্যাতিত শিশুর কেস ব্যবস্থাপনা	১২
৮	উপসংহার	১২

ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে শিশু নির্যাতন একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশু নির্যাতনের কবল থেকে একটি ২-৩ বছরের শিশুও বাদ পড়ছে না। প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও একটি-দুটি ঘটনা ঘটেই চলেছে। দেশে বিদ্যমান আইন রয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মী রয়েছে, সমাজের দায়িত্বিবান মানুষ রয়েছে, তথাপি এর কবল থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। বর্তমানে দেশে শিশু আইন-২০১৩ তৈরি হয়েছে, শিশু নীতিমালা-২০১১ করা হয়েছে, 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন' নামে একটি আইনও এক যুগেরও বেশী আগে তৈরি হয়েছিল। আর জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ১৯ এ বলা হয়েছে- সব ধরনের সহিংসতা থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এত কিছু থাকার পরও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করাটাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশু নির্যাতনের কবল থেকে দেশ তথা সমাজ আশু পরিত্রাণ চায়। সবারই কামনা একটাই-কোন একটি শিশুকেও যেন নির্যাতনের শিকার হতে না হয়, প্রতিটি শিশুই যেন তার সুন্দর আর আনন্দদায়ক সোনালী শৈশব নির্বিঘ্নে কাটিয়ে আগামী দিনের জন্য সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে পারে।

শিশু নির্যাতন কী?

শুরুতেই যেটি সকলের জানা প্রয়োজন তা হচ্ছে- শিশু নির্যাতন কী। এক কথায় শিশু নির্যাতন হচ্ছে- কোন ব্যক্তি দ্বারা শিশুর প্রতি অন্যায় আচরণ কিংবা তাকে এমন কোন কাজে বাধ্য করা হয় যার ফলে শিশুর শারীরিক, মানসিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে কিংবা শিশুর জন্য দীর্ঘমেয়াদী বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শিশুর নির্যাতনকারী কে হতে পারে?

একটি সমাজে বসবারকারী যেকোন ব্যক্তির দ্বারাই একটি শিশু নির্যাতিত হতে পারে। যেমন:

- শিশুর মাতা-পিতা
- আত্মীয়স্বজন
- প্রতিবেশী কিংবা সমাজে বসবাসকারী যেকোন ব্যক্তি
- সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান
- প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা ও কর্মী
- চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বরত কর্মী
- সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ
- বন্ধু-বান্ধব
- গণমাধ্যম ও গণমাধ্যম কর্মী/সাংবাদিক
- সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদি।

শিশু নির্যাতনের ধরন:

দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশু নির্যাতনের ধরন নানা রকম হতে পারে। তবে, শিশু নির্যাতন প্রধানত পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে:

- শারীরিক নির্যাতন
- মৌখিক নির্যাতন
- যৌন নিপীড়ন/নির্যাতন
- মানসিক বা আবেগীয় নির্যাতন
- অবজ্ঞাসূচক আচরণ

শারীরিক নির্যাতন:

শারীরিক নির্যাতন হচ্ছে- কারও দ্বারা শারীরিকভাবে আক্রমণ, কোন ধরনের আঘাত কিংবা হামলার শিকার হওয়া। এই আক্রমণ কোন বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা হতে পারে আবার সম বয়সী কিংবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী কারও দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। শারীরিক নির্যাতনের ধরনের মধ্যে রয়েছে-

- সজোরে আঘাত করা/বেত, লাঠি, রড দিয়ে পেটানো
- জলন্ত সিগারেট, ম্যাচের কাঠি বা গরম পানির ছ্যাঁকা দেয়া/পুড়িয়ে দেয়া
- ধারালো বস্তু/ছুরি দিয়ে আঘাত করা
- গলা টিপে ধরা/শ্বাস রোধ করা
- আলমারী বা অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করে রাখা
- সজোরে ঝাকুনি দেয়া/ছোট শিশুকে ঝাকানো
- ঘুষি দেয়া/চড় দেয়া
- লাথি দেয়া/ধাক্কা দেয়া
- কান কিংবা চুল ধরে টানা

> সাম্প্রতিককালের সিলেটে মোবাইল চুরির সন্দেহে পাশবিক নির্যাতনের শিকার শিশু রাজনের করুণ মৃত্যু কিংবা শিশু গৃহ পরিচারিকা আদুরীকে নির্যাতন করে রাস্তার পাশের আবর্জনার স্তুপে ফেলে রাখা শারীরিক নির্যাতনের জ্বলন্ত উদাহরণ।

বাবা-মা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, শিক্ষক এবং অন্য বড়রা যাদের শিশুদেরকে যত্ন নেয়ার কথা, তারা শিশুদেরকে এমনভাবে শাস্তি দেন যার ফলে শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত পায়। এই শাস্তির নেতিবাচক ফলাফল অনেকসময় দীর্ঘস্থায়ী হয় যা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত ধারণা:

- শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা একটি সঠিক উপায়
- শিক্ষকরা সবসময় শিশুদের ভাল চান। তারা তো ভালোর জন্যই মারেন
- শিশুদেরকে শাসনের মধ্যে রাখলে তারা বাধ্য থাকে

শিশুর বিকাশে শারীরিক নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব:

- শারীরিকভাবে আহত বা জখম
- শরীরের বাইরে কাটা ও কাটা দাগ/ক্ষতচিহ্ন
- মস্তিষ্কের ক্ষতি
- পঙ্গুত্ব বরণ বা কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু

মৌখিক নির্যাতন:

শিশুর মনে কষ্ট দেয়ার জন্য অথবা শিশুকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন কেউ তাকে খারাপ ভাষায় বকাঝকা করে কিংবা শাসায় সেটিই মৌখিক নির্যাতন।

কিছু মৌখিক নির্যাতনের নমুনা:

- শিশুর সাথে জোরে চিৎকার করে কথা বলা
- শিশুকে গালিগালাজ করা
- শিশুকে বোকা, কুৎসিত বা অন্য কোন বিশেষণে অভিযুক্ত করা
- শিশুকে ভয় দেখিয়ে শাসানো
- শিশুকে সার্বক্ষণিক দোষারোপ করা
- শিশুকে এমন কথা বলা যে তাকে কেউ ভালবাসে না

শিশুকে মৌখিকভাবে নির্যাতন বা আঘাত করলে সে নিজেকে ছোট মনে করে। বিশেষ করে যাদের কাছ থেকে তার আদর পাওয়ার কথা। মৌখিক আঘাতের কারণে কোমল শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার ফলে বড়দের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা/বিদ্বেষ জন্ম নেয়। এই বিদ্বেষ অনেকসময় দীর্ঘস্থায়ী হয় যা সামাজিক সম্পর্কহীনতায় রূপ নেয়।

যৌন নির্যাতন:

যৌন নির্যাতন হচ্ছে এমন এক ধরনের শিশু নির্যাতন যেখানে কোন শিশু কোন ব্যক্তি বিশেষ করে বয়স্ক কোন ব্যক্তি বা কিশোর-কিশোরী দ্বারা যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। আরও পরিস্কারভাবে বলতে গেলে- শিশুর তুলনায় বেশি দায়িত্বশীল, ক্ষমতাবান অথবা আস্থাশীল কোন বয়স্ক ব্যক্তি অথবা একই বয়সী কোন ব্যক্তি যদি নিজের তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিশুটিকে যৌনকর্মে বাধ্য করে, তখন তাকে যৌন নির্যাতনকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে। উল্লেখ্য যে, কারো কারো ধারণা যৌন নির্যাতনকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র একজন পুরুষ ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু, এটি সব ক্ষেত্রে সঠিক নয়। নারী পুরুষ যে কেউই নির্যাতনকারী হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যৌন নির্যাতনকারী ব্যক্তিটি হয় নিকট আত্মীয় কিংবা শিশুর চেনা জানা পরিচিত কেউ যে কিনা শিশুটিকে আদর করার উছিলায় দুরভিসন্ধি এঁটে যৌন নির্যাতন সংঘটিত করে থাকে।

যৌন নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে-

- কোন শিশুকে যৌন কাজের জন্য বলা বা জোর করা
- শিশুর প্রতি যৌনাঙ্গ প্রদর্শন
- শিশুকে যৌনতা সংক্রান্ত ছবি দেখানো
- শিশুকে যৌনতা সংক্রান্ত গল্প বলা
- শিশুর সাথে যৌন স্পর্শ
- শিশুকে ধর্ষণ করা বা শিশুর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা

প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিশু নির্যাতনকারী শিশুকে নির্যাতনের পর ভয় দেখিয়ে কিংবা লোভ দেখিয়ে ঘটনাটি গোপন রাখতে বলে। কিন্তু, এটি শিশুর জন্য দীর্ঘমেয়াদী কুফল বয়ে আনে যার পরিণতিতে সে মারাত্মকভাবে মানসিক চাপের মধ্যে দিন অতিবাহিত করে বেড়ায়।

এছাড়া, বাণিজ্যিক যৌন নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে জবরদস্তিমূলক বেআইনি যৌনকর্মে শিশুকে বাধ্য করা, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা বা বাধ্য করা, পর্ণোগ্রাফি ব্যবসায় নিয়োজিত করা, ইন্টারনেটে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছবি তোলা, অর্থাৎ, বেআইনিভাবে শিশুকে যৌন কাজে ব্যবহার করাই হচ্ছে শিশুর যৌন নির্যাতন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯৯)। বর্তমানে প্রচলিত প্রযুক্তি যেমন, ইন্টারনেটে বয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক শিশুদেরকে ভার্চুয়াল যৌনকর্মে অংশগ্রহণে প্রবৃত্ত করে, সেটিকেও যৌন নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত ধারণা:

- মেয়ে শিশুই কেবলমাত্র যৌন নির্যাতনের শিকার হয়
- সুন্দর ও আকর্ষণীয় শরীরের শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে
- শিশু নির্যাতন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বেশী ঘটে

আসল কথা হচ্ছে- যেকোন শিশু, ছেলে অথবা মেয়ে, গ্রাম কিংবা শহরের, ধনী কিংবা দরিদ্র পরিবারের, সুস্থ কিংবা প্রতিবন্ধী, সুন্দর কিংবা কম সুন্দর, সুস্বাস্থ্য কিংবা ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী, গায়ের রং ফর্সা কিংবা শ্যামল বর্ণের, যেকোন বয়সের শিশুই যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে।

শিশুর বিকাশে যৌন নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব:

- শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত
- অপরাধবোধ বা নিজেকে দোষী ভাবা
- আত্ম-মর্যাদাবোধের সমস্যা
- মানসিক চাপ/দুঃস্বপ্ন
- আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া

কিভাবে শিশুরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে

প্রথমেই প্রতিটি শিশুকে জানতে হবে যৌন নির্যাতন বিষয়টি কী এবং কিভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়। এজন্য শিশুদেরকে এই বিষয়টির উপর পরিস্কার ধারণা দিতে হবে। পরিবার থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সমাজকর্মী, উন্নয়ন কর্মী ও সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ সকলেরই এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুরা নিজেদেরকে যেভাবে রক্ষা করতে পারে:

- যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি থাকলে দ্রুত সরে পড়া
- যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে 'না' বলা
- প্রয়োজনে চিৎকার করে আশেপাশের সকলকে জানানো
- ঘরে একলা থাকলে দরজা না খোলা
- একলা কিংবা অপরিচিতের সাথে কোথাও না যাওয়া
- নির্জন রাস্তা পরিহার করা
- অপরিচিত কারও দেয়া কোন খাদ্যদ্রব্য না খাওয়া
- কোন উপহার সামগ্রীর বিনিময়ে কিছু না দেয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য না থাকা
- কারও কাছ থেকে পাওয়া উপহার সামগ্রীর বিষয়টি বাড়ির সকলকে জানানো
- সংঘটিত যৌন নির্যাতনের বিষয়ে নিশ্চুপ না থাকা
- নির্যাতনের বিষয়ে মা-বাবাকে খুলে বলা
- মনে রাখা যে, যৌন নির্যাতনকারীই প্রকৃত দোষী, শিশুটি নয়
- আরও মনে রাখতে হবে যে, নির্যাতনের ঘটনার কথা আপনজন কাউকে না বললে নির্যাতনকারী অন্য আরও অনেক শিশুকে নির্যাতন করার সুযোগ পাবে

মানসিক বা আবেগীয় নির্যাতনঃ

মানসিক বা আবেগীয় নির্যাতন হচ্ছে- মানসিকভাবে নির্যাতন করা যার মধ্যে রয়েছে- অপমানসূচক কথা বলা, লজ্জা দেয়া, বিশেষ করে অন্য সকলের সামনে অতিমাত্রায় সমালোচনা করা কিংবা উপহাস করা, কলঙ্ক লেপন, যোগাযোগ বন্ধ করা, ভর্ৎসনা করা, ব্যক্তিগত কিংবা গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া ইত্যাদি। এছাড়া, শিশুর চলাফেরায় বাধা দেয়া, বঞ্চিত করা, কোন কারণে তাকে জব্দ করা, ভয় দেখানো কিংবা শাসানো, বৈষম্যমূলক ব্যবহার, বিদ্রুপ করা বা অন্য যেকোন ধরনের বৈরি আচরণ মানসিক বা আবেগীয় নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৯৯)।

মানসিক বা আবেগীয় নির্যাতন সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত ধারণাঃ

- মানসিকভাবে কষ্ট পেলেও একটা সময়ে সবাই সবকিছু ভুলে যায়
- শিশুদের অনেক ঘটনাই পরবর্তীতে আর মনে থাকে না
- শিশুকে যৌন নির্যাতন করাটা শারীরিক আঘাত মাত্র, অন্য কোন ক্ষতি হয় না
- শিশুরা অনেক কিছুই বোঝে না
- শিশুদের মান-সম্মানকে বড় করে দেখতে নেই, তাহলে সে গোল্লায় যাবে
- শিশুদের চাহিদা খুব একটা থাকতে নেই
- পড়াশুনার ক্ষেত্রে কান ধরে ওঠ বস করাটা দোষের কিছু নয়

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানসিক বা আবেগীয় নির্যাতনের কারণে অনেক শিশুর জীবনে দীর্ঘমেয়াদী কুফল বয়ে আনে যার পরিণতিতে সে মারাত্মকভাবে মানসিক চাপের মধ্যে দিনযাপন করে থাকে। যৌন নির্যাতনের শিকার কোন শিশুর মনের কষ্ট শরীরর আঘাতের চেয়ে অনেক বেশী গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। এই সময় অবশ্যই শিশুর মানসিক সহযোগিতা পাবার অধিকার রয়েছে। এছাড়া, শিশুর কাছের কোন ব্যক্তির আচরণে বা ঘটনার প্রভাবেও শিশুর স্বাস্থ্য, মন, মনোবল, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ বিঘ্নিত হতে পারে।

শিশুর বিকাশে মানসিক বা আবেগীয় নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাবঃ

- শিশুর আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তাবোধ ও অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরিতে বাধাগ্রস্ত করে
- নির্যাতিতরা নিজেদেরকেই দোষী মনে করে
- নির্যাতনকারীর প্রতি মারমুখী হয়ে পড়ে
- দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে
- আত্মহত্যার চূড়ান্ত পথ বেছে নেয়

অবজ্ঞাসূচক আচরণঃ

মাতাপিতা, পরিবারের সদস্য, শিক্ষক কিংবা সেবাযত্নকারী ব্যক্তি কর্তৃক যত্নের অভাব কিংবা অবহেলাপূর্ণ আচরণ। অর্থাৎ, শিশুকে তার মৌলিক অধিকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, আশ্রয়, খাদ্য ও নিরাপদ বসবাসের পরিবেশ ইত্যাদি যা যা যোগানো আবশ্যিক, সেক্ষেত্রে অমনোযোগ বা অবহেলা করা। এর পাশাপাশি রয়েছে আবেগীয় সহযোগিতা যেমন, লালন-পালন, আদর-স্নেহ ইত্যাদি যার অপূর্ণতার পরিণতিতে শিশুর অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। এক কথায়, যে ক্ষতি শিশুর স্বাস্থ্য, মন, মনোভাব, নীতিবোধ ও সামাজিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। শিশুকে সব ধরনের বিপদ ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচাতে যদি তার লালন-পালনকারী গাফিলতি করে বা ব্যর্থ হয়, সেটাও অবহেলামূলক আচরণের মধ্যে পড়ে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৯৯)।

অবজ্ঞাসূচক আচরণ বা অবহেলার কয়েকটি নমুনাঃ

- শিশুর সাথে কথা না বলা কিংবা তার প্রশ্নের উত্তর না দেয়া
- দীর্ঘসময় ধরে শিশুকে একলা রাখা
- শিশুকে পর্যাপ্ত খাবার না দেয়া কিংবা সেবাযত্ন না করা
- শিশুকে ভাল না বাসা

শিশুর বিকাশে অবজ্ঞাসূচক আচরণের নেতিবাচক প্রভাবঃ

- ধীর গতিতে মস্তিষ্কের বিকাশ
- সার্বক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা
- রোগ, দুর্ঘটনা ও আঘাত প্রাপ্তির ঝুঁকি
- অনাগ্রহ প্রদর্শন ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি অবহেলাসূচক আচরণঃ

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি অবহেলাসূচক আচরণে ওই বিশেষভাবে অসুবিধাগ্রস্ত শিশু আরও অধিক ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে পড়ে। অনেকে অনুচিত হলেও ভাবেন, অন্য শিশুদের ক্ষেত্রে যা নির্যাতনমূলক আচরণ, সেটা প্রতিবন্ধী শিশুর বেলায় তেমন পার্থক্যের উদ্রেক করে না। নানা কারণে এটি হতে পারে। প্রতিবন্ধী শিশুর সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বা আচরণ নিয়ে ভাবলেই হবে না, বরং দেখতে হবেঃ

- শিশুর বসবাসের পরিবেশ কী ধরনের
- ঐ জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধী শিশুটিকে কী চোখে দেখছে
- শিশুটির ব্যক্তিগত মনোভাব ও মূল্যবোধের স্বরূপ কী

সমাজের মানুষ প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে যে আচরণ করে, সেটা বুঝতে ও ব্যবস্থা নিতে নিচের দু'টো বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে:

- প্রতিবন্ধীর প্রতি কোন ব্যক্তির নির্যাতনমূলক আচরণ বা মনোভাব যেন আরও তীব্র না হয়
- প্রতিবন্ধী শিশুর সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্থার কর্মীরা যেন নিরন্তরভাবে কাজ করে যান

প্রতিবন্ধী শিশুর নির্যাতন বিষয়ে দুইভাবে ভাবা যায়:

- একটি হচ্ছে- নির্যাতনের ফলে কিভাবে শিশুর মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে
- অপরটি হচ্ছে- শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার সাথে এটি কতটুকু সম্পর্কযুক্ত।

পেশাগত অভিজ্ঞতা ও গবেষণা থেকে জানা গেছে, প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঐ শিশুদের অন্যান্য ধরনের বিকাশ খুব একটা বাধাগ্রস্ত হয় না। শিশুর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে সহায়তা দিলে পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বিভিন্ন গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফলাফল থেকে বলা যায়, প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। মানবিক ত্রাণ কর্মসূচির কর্মীরা সম্ভবত প্রতিবন্ধী শিশুদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার অনেক ঘটনাই হয়তো দেখে থাকবেন। শিশুর শৈশবকালীন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা ও তার পরবর্তী বাকি জীবন ও অভিজ্ঞতার ইতিহাসকে মোটেই আলাদাভাবে দেখা উচিত নয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের নির্যাতনের বিষয়টি অনেক সময়ই তেমনভাবে দৃশ্যমান হয় না।

প্রতিবন্ধী শিশুর নির্যাতন সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত ধারণা:

- প্রতিবন্দী শিশুরা নিজেই নিজেকে আঘাত করে থাকে
- প্রতিবন্দী শিশুর আচরণ বরাবরই মারমুখী
- প্রতিবন্ধী শিশুর অভিযোগ সবসময় সঠিক বলে মেনে নেয়া ঠিক নয়, কারণ ওরা ঠিক জানে না ওরা কী বলে
- প্রতিবন্ধী শিশুর মঙ্গলের জন্যই তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা, ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা, কম খেতে দেয়া কিংবা কাপড়-চোপর পরতে দেয়া হয় না।

তবে, সকলকে এটি বোঝা এবং মেনে নেয়া দরকার যে, প্রতিবন্ধী শিশু প্রতিনিয়তই নির্যাতন ও ক্ষতির শিকার হতে পারে এবং সে ক্ষতি অনেকসময় মারাত্মক হতে পারে; উদাহরণস্বরূপ, যে প্রতিবন্ধী শিশুটি নিজে খেতে পারে না, তাকে খাইয়ে না দিলে সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়বে, হয়তো মারাই যাবে। সুতরাং, প্রতিবন্ধী শিশুর সুরক্ষা পরিকল্পনায় তাই অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন।

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের উপায়:

শিশুদেরকে নির্যাতন/নিপীড়ন কিংবা সবধরনের সহিংসতা থেকে রক্ষা করাটা জরুরী। একটি শিশুর সুস্থ থাকার, পড়ালেখা করার, খেলার এসব সহিংসতা থেকে নিরাপদে থাকার অধিকার রয়েছে।

মাতাপিতা/অভিভাবক/শিক্ষক/সেবা প্রদানকারীর দিক থেকে:

- শিশুদেরকে কোন অবস্থায় নির্যাতন করা যাবে না, এমনকি নিজের সন্তানকেও নয়। সন্তানকে ভালবাসতে হবে, উপদেশ দিতে হবে এবং বুঝিয়ে শাসন করতে হবে। শিশুরা যেন কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক শাস্তি না পায়। এটি শিশুর বিকাশে বাধাগ্রস্ত হয়।
- শিক্ষকগণকে শ্রেণিকক্ষে শিশুকে শাস্তি দেয়াটা পরিহার করতে হবে। কখনোই এটি করা যাবে না। এটি সম্পূর্ণভাবে অন্যায়। এছাড়া, মৌখিক শাস্তি, রুঢ় আচরণ, ভয়-ভীতি কিংবা ধমক দেয়া যাবে না।
- উন্নয়ন কর্মী দ্বারাও শিশুরা নির্যাতিত হতে পারে। সুতরাং, উন্নয়ন কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানে কাজের শুরুতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা' পড়িয়ে ও তা মেনে চলার জন্য সকলকে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। তাদেরকে এই মর্মে জানাতে হবে যে, শিশু নির্যাতনকারীর প্রতি সংস্থাটি 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করা হয় এবং এ ব্যাপারে কোন ধরনের আপোষ বা সহনশীল হওয়ার ন্যুনতম সুযোগ নেই।
- শিশুকে কোথাও একলা পাঠানো যাবে না। নিজে সাথে থাকা কিংবা একান্ত বিশ্বস্ত কারো সাথে কোথাও পাঠাতে হবে।
- শিশুর বন্ধু-বান্ধবের সাথে (বিশেষ করে সমবয়সী ও বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে) ঘনিষ্ট সম্পর্কের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
- শিশুর সাথে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। তাকে বিভিন্ন ঝুঁকির বিষয়ে প্রতিনিয়ত সচেতন করতে হবে। কোন দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকলে আগে থেকেই শিশুকে সাবধান করে দিতে হবে এবং দুর্ঘটনা ঘটার পর শিশুকে যথাযথ কাউন্সেলিং করতে হবে এবং নির্যাতনের মাত্রা সাপেক্ষে দ্রুত প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিশুদের দিক থেকে: 'না'

- যেকোন সহিংসতা এড়াতে **'না'** বলা। বয়স্ক কেউ 'ঘনিষ্ট হতে চাইলে অনিষ্টই বেশি' এটি বুঝতে হবে। কেউ শরীর স্পর্শ করতে চাইলে বা এটি অস্বস্তির কারণ হলে সরাসরি **'না'** বলতে হবে।
- কিছু 'গোপন কথা বা ঘটনা' কখনোই লুকানো যাবে **না**। কেউ যদি লুকিয়ে রাখার কিংবা গোপন করা বা চেপে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও করায়, তথাপি এসব ঘটনার কথা গোপন করা যাবে না। কেননা নির্যাতনকারীরা ঠিকই জানে যে এটি তারা অন্যায় করেছে এবং তার জন্য তাদের সাজা পেতেই হবে, এই কারণে তারা সর্বদা শিশুদেরকে ঘটনার কথা চেপে

রাখতে বলে। তাই, এসব ঘটনা ঘটার পর দ্রুত বাবা-মা, আত্মীয় কিংবা বিশ্বস্ত কাউকে জানাতে হবে। কারণ, শিশুকে নির্যাতন, নিপীড়ন কিংবা অবহেলা-অবজ্ঞা করার অধিকার কারও নেই।

- স্পর্শ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কোন্‌টি 'ভাল স্পর্শ' আর কোন্‌টি 'মন্দ স্পর্শ' তার পার্থক্য বুঝতে হবে। শরীরের স্পর্শকাতর এমন স্থানে কিংবা এমনভাবে স্পর্শ না করা যা কাউকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।
- কেউ যদি কোন ধরনের নির্যাতন কিংবা ক্ষতি করার চেষ্টা করলে দ্রুত সেই স্থান থেকে সরে আসতে হবে।
- প্রয়োজনে চিৎকার করে আশেপাশের সকলকে পরিস্থিতি জানাতে হবে। কেউ নির্যাতন কিংবা ক্ষতি করার চেষ্টা করলে চিৎকার করা ও সাহায্য চাইতে কোন প্রকার দ্বিধা না করা
- যে কেউ কোন উপহার দিতে চাইলেই উপহার না নেয়া। আগে বুঝতে হবে কেউ কোন ধরনের খারাপ কাজ করানোর উদ্দেশ্যে উপহার দিয়েছে কিংবা দিতে চাচ্ছে কিনা।
- কোন সংঘটিত নির্যাতন কিংবা নির্যাতনে ঝুঁকি থাকলে সে বিষয়ে মাতা-পিতা, সহপাঠী, বন্ধা-বান্ধব কিংবা বিশ্বস্ত কাউকে খুলে বলা।
- শিশুর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে শেখা ও বোঝা এবং প্রয়োজনে প্রতিকারের লক্ষ্যে বিশ্বস্ত কাউকে জানানো। মনে রাখতে হবে, প্রতিরোধ কিংবা প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিলে নির্যাতনকারী পরবর্তীতে আরও নির্যাতন করার সুযোগ পেয়ে যাবে। এতে করে অন্য শিশুরাও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

হেল্পলাইন: ১০৯৮

শিশুকে নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে কিংবা নির্যাতিত শিশুকে সার্বিক সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি 'হেল্পলাইন' নামে একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই 'হেল্পলাইন' এর একটি সুনির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর রয়েছে যা '১০৯৮' নামে পরিচিত। কোন শিশুর প্রতি নির্যাতনের কোন প্রকার ঝুঁকি থাকলে কিংবা নির্যাতন সংঘটিত হলে শিশুটিকে সুরক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে যে কেউই দ্রুত এই '১০৯৮' নম্বরে ফোন করে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন। কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি জেনেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিবেন।

নির্যাতিত শিশু সনাক্তকরণ:

নির্যাতিত শিশুকে সনাক্ত করার কাজটি খুবই দুরূহ একটি ব্যাপারে। অনেকসময় নির্যাতিত শিশু নিজেই কিংবা তাদের মাতা-পিতা/অভিভাবকগণ সামাজিক মান-সম্মানজনিত কারণে নির্যাতনের বিষয়টি আড়াল করে থাকেন বা চেপে যান। সুতরাং, প্রায়শই মূল ঘটনাটি সকলের অগোচরেই থেকে যায়। এক্ষেত্রে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে। সকলের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছাতে হবে যে, শিশু নির্যাতনকে প্রতিহত করা একটি আইনি ও সামাজিক দায়িত্ব। নির্যাতনকারীর শাস্তি না হলে সে বারবার এই কাজ করে যেতে থাকবে। সুতরাং, পুরো ঘটনাটি অনতিবিলম্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবগত করাতে হবে যাতে করে এর প্রতিকারের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সহায়ক হয়।

নির্যাতিত শিশু সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে যেসকল বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে:

শারীরিক পর্যবেক্ষণ	• আঘাতের চিহ্ন/কালসিটে দাগ • পোড়া/ছ্যাঁকার দাগ • অস্বাভাবিক ক্ষত • হাত-পা ভাঙ্গা/মচকানো
মানসিক পর্যবেক্ষণ	• অন্যমনষ্ক থাকা • অস্থির • আক্রমণাত্মক • মনোযোগ দেয়ার সমস্যা • নিজেকে গুটিয়ে নেয়া • ক্লান্ত থাকার চিহ্ন: চোখে ঘুম ঘুম ভাব • দু:খী চেহারা

বিশেষ সুরক্ষা চাহিদার শিশুকে সনাক্ত করার উপায়:

নির্যাতিত শিশু ছাড়াও বিশেষ সুরক্ষা চাহিদা সম্পন্ন শিশুকেও সনাক্ত করাটা জরুরী। এজন্য মাতা-পিতাসহ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ সুরক্ষা চাহিদার শিশুকে চিহ্নিত করার বিষয়টি সাধারণত সেই সকল ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যাদের সাথে শিশুর দৈনিক বা নিয়মিত যোগাযোগ হয়, যেমন- পরিবারের লোকজন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী। শিশুর পরিবার, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অথবা সকলের জন্য উন্মুক্ত স্থান, পার্ক কিংবা খেলার মাঠ যেখানে শিশুরা খেলে বা সময় কাটায় সেই স্থানে গিয়ে শিশুদের সাথে কথা বলে তার বিশেষ সুরক্ষার চাহিদা সম্পর্কে জানা যেতে পারে। মাতা-পিতা, শিক্ষক, সমাজকর্মী, বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মী সবারই এই চিহ্নিতকরণের কাজে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।

বিশেষ সুরক্ষা চাহিদা শিশু সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে যেসকল বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে:

শারীরিক/স্বাস্থ্যগত	• প্রতিবন্ধী শিশু • দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত/এইচআইভি সংক্রমিত শিশু
ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	• কারখানায় ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু • শোষণমূলক শ্রমে নিয়োজিত শিশু • বর্জ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত শিশু • জোরপূর্বক যৌন কাজে বাধ্য করা হয়েছে এমন শিশু
পথশিশু	• পরিবার বিচ্ছিন্ন পথশিশু • মাতা-পিতাহীন এতিম/অনাথ শিশু • পাচার হওয়া/পাচারের ঝুঁকিতে থাকা শিশু

	• গ্রাম থেকে আসা মাতাপিতা ছাড়া অভিবাসী শিশু • ঠিকানাবিহীন/হারিয়ে যাওয়া শিশু • বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা শিশু • অতি দরিদ্র পরিবারের শিশু যাকে ভরনপোষণ দেয়া পরিবারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না

নির্যাতিত/বিশেষ সুরক্ষা চাহিদার শিশুর কেস ব্যবস্থাপনাঃ

নির্যাতিত বা বিশেষ সুরক্ষা চাহিদার শিশুর সংবাদ পাওয়া গেলে উক্ত শিশুর কেস ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা জরুরী। প্রাথমিক অবস্থা শিশুটির একটি প্রাথমিক এসেমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে। এই এসেসমেন্টের মধ্যে রয়েছে:

- শিশুর নাম, বয়স, লিঙ্গ ও ঠিকানা
- শিশুর পরিবারের বিবরণ (আর্থ-সামাজিক অবস্থা)
- শিশুর শারীরিক, মানসিক, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অবস্থা
- শিশুকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে
- ঝুঁকিতে পড়ার কারণ ও ঝুঁকির মাত্রা
- তাৎক্ষণিক কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন
- দীর্ঘমেয়াদী কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন
- এই মুহুর্তে শিশুর জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি

শিশুটির প্রাথমিক এসেমেন্ট সম্পন্ন করার পর শিশুর জন্য সমাজসেবা অধিদফতর প্রদত্ত ইনটেক ফরম-১ পুরণ করতে হবে। ইনটেক ফরম-১ পুরণ করারা পর ঝুঁকির মাত্রা সাপেক্ষে প্রয়োজনবোধে বিস্তারিত এসেসমেন্ট ফরম (ফরম-২) পুরণ করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে কেস ব্যবস্থাপনা ফরম- ৩, ৪ ও ৫ অনুসরণ করে প্রতিটি শিশুর কেস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কেস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন সময়ে কেসের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি শিশুকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। তার চাহিদা যথাযথভাবে পুরণ হচ্ছে কিনা, কোন ধরনের অবহেলা কিংবা কাজে গাফিলতি হচ্ছে কিনা সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে। কেস সম্পন্ন হয়ে গেলে যথারীতি কেস 'ক্লোজ' বা বন্ধ করতে হবে।

উপসংহারঃ

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্যাতিত শিশুর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও কেস ব্যবস্থাপনা একটি সময়সাপেক্ষ ও দক্ষতানির্ভর কার্যক্রম। এ জন্য সংস্থার কর্মীদেরকে যথারীতি দক্ষ হতে হবে এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হবে। মনে রাখতে হবে, নির্যাতিত শিশুরা অন্যায় করেনি, তারা শুধুমাত্র অন্যায় আচরণের শিকার। শিশুদের উপর এই অন্যায় আচরণ ও নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারলে শিশুরা সব ধরনের সহিংসতা থেকে রক্ষা পাবে। আনন্দের সাথে কাটাতে পারবে কাঙ্খিত এক সোনালী শৈশব।

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

বাড়ি নং ৯৩, রোড নং ১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল: grambangla@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.grambanglabd.org